Bhatter college ,Dantan

Department of history

Priyaranjan Patra

Class:4th sem (P.G)

Paper :401

Note :Swadeshi technology

Scanned with CamSc

উপনিবেশের বিজ্ঞান ও তার রূপলেখা

ঔপনিবেশিকতা ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারিত। আমরা সাধারণত, ঔপনিবেশিক রাজনীতি, ঔপনিবেশিক সমাজ, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বা ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের উল্লেখ করে থাকি, কিন্তু এই ঔপনিবেশিকতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আওতার মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কি আনা যায়? 'ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান' নিয়ে কি কোনও রকম আলোচনা করতে পারা যায়? বিজ্ঞানের যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা বা ব্যাপ্তি প্রশ্নাতীত। বিশ্ব ইতিহাসের উপর, বিজ্ঞান বা শিল্প বিপ্লবের প্রভাবও প্রশ্নাতীত, কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবেই বলা যায়, এই ইতিহাসে ঔপনিবেশিকতার প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। কারো মতে ঔপনিবেশিকতা যুক্তিপূর্ণ, আবার কেউ বলেন যুগোপযোগী আদর্শ।

ঔপনিবেশিক বিস্তার কোনও অসংলগ্ন ঘটনা নয়। আদর্শ বা ভাবধারার স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিকাশের অবদান অনস্বীকার্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই স্থানান্তর ছিল আদান-প্রদান ভিত্তিক কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কর্তৃত্ব বা প্রাধান্যের প্রয়োগ। "কর্তৃত্ব, প্রাধান্য ও শাসনই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের সারমর্ম"[১] —সাম্রাজ্যবাদের তুঙ্গ অবস্থার এই ছিল উপলব্ধি। একজনের প্রাধান্য মানে অপরজনের পরাধীনতা—এই অযুগ্ম সমীকরণই ছিল ঔপনিবেশিকতার ভিত্তি। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় এইভাবে করা যেতে

Scanned with CamSc

পারে—"পরাধীন বিজ্ঞান যেখানে ফলদায়ক, ফলিত বিজ্ঞানের গুরুত্ব, অনুসন্ধানী ও গবেষণামূলক মৌল বিজ্ঞানের থেকে অনেক বেশি।"[১] যদিও এই সংজ্ঞা আমার মতে আদৌ যথোপযুক্ত নয়। মৌল বিজ্ঞান, ও ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যগুলি প্রথম প্রকাশ পায় ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে, যদিও এই পার্থক্যগুলি এখনও সুস্পষ্ট নয়। এই সংজ্ঞার ক্ষেত্রে 'ফল ভিত্তিকের' পরিবর্তে 'ক্ষমতা ভিত্তিক' এবং 'অনুসন্ধান'-এর পরিবর্তে 'জ্ঞান' উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা 'ক্ষমতা' এবং 'জ্ঞান' একই মুদ্রার দুটি দিক। এই মতে ক্ষমতা বা জ্ঞান, ক্ষমতা বা সংস্কৃতির আর একটি দিক। এই দুই-এর সংমিশ্রণেই কর্তৃত্ব বা প্রাধান্যের সৃষ্টি। এই কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই নির্বিরোধ নয়, এমনকী একচ্ছত্র ক্ষমতার মধ্যেই ক্ষমতাচ্যুতির বীজ নিহিত থাকে। ঔপনিবেশিকতার মধ্যে রয়েছে একত্ব ও দ্বন্দ্ব, লক্ষ ও বৈপরীত্য, ক্ষমতা ও দুর্বলতা। একগুচ্ছ গঠনপ্রণালী ও একগুচ্ছ আলোচনাভিত্তিক তত্ত্ব, এগুলিকে একত্রীভূত করেই প্রাধান্য বা কর্তৃত্বের বিভিন্নরূপ প্রকাশ হয়েছে। এই প্রাধান্য বা কর্তৃত্বই ঔপনিবেশিক, এবং উপনিবেশের অধিবাসীদের অস্তিত্ব, তাদের দেহ ও মন সমস্ত কিছুই প্রভাবিত করেছিল। যেহেতু বিজ্ঞান, সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সুতরাং এক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম থাকার কথা নয়, আর এই থেকেই আমরা পাই 'ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের' মতো বিষয়ের চেহারা।

বহু বছর ধরে এই বিষয়ের ওপর যে সমস্ত কাজ করা হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে পূর্বোক্ত আলোচনার একটি রূপরেখা টানা যায়। এই বিষয়ের ওপর প্রথম বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমরা পাই সম্ভবত ১৯৪২ সালে, চার্লস ফোরম্যানের গবেষণামূলক নিবন্ধ 'সায়েন্স ফর এমপ্যায়ার'-এ, যেখানে ১৮৯৫ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[২] ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়, যেগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নানা প্রাণবন্ত বিতর্ক ও কিছু নতুন গবেষণাও। ফলস্বরূপ ১৯৮০ সালে প্রচুর প্রবন্ধ ও রচনা আমরা পাই। ১৯৫০-এর শেষ ভাগে ডুপ্রি এবং বার্নাড কোন লেখেন, যে আমেরিকাই ইউরোপের বিজ্ঞানের উৎস।[৩] পরবর্তীকালে, ডোনাল্ড ফ্লেমিং মার্কিন ধ্যানধারণাগুলি অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন এবং তাঁদের মিল ও অমিলগুলিরও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। একটি সাধারণ উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল, যে 'প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিরীক্ষাই' ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞান সম্পর্কিত উদ্যোগগুলির পথপ্রদর্শক। তাঁর মতে ব্যবহারিক প্রয়োজন বা সম্ভাবনার অনুমান, এই দুই-এর যুগপৎ প্রেরণাই, এই নিরীক্ষাগুলিকে অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং ঔপনিবেশিক উদ্যোগেরও সৃষ্টি করে।[৪] বস্তুতপক্ষে উপনিবেশের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনের সাথে সাথে, তার আর্থিক লাভের সম্ভাবনার পরিচয় দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল। ফ্লেমিং দু'টি স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছিলেন—(১) ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ (যেমন লিনিয়াস বা ব্যাঙ্কস), যাঁদের ব্যবহার ছিল অনেকটা অনুপস্থিত জমিদারদের

Scanned with CamScanner

আধুনিক শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করার জন্য ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে একটি শিল্পপ্রদর্শনী করেন। এই ধরনের প্রদর্শনী শীঘ্রই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ফলে এই শিল্প প্রদর্শনী প্রতিবছর নিয়মিত করা হয়। ভারতীয় শিল্পপতিদের সহযোগিতায় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে "বার্ষিক শিল্প আলোচনা অনুষ্ঠান" হতে থাকে। অবশ্য ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তির জন্য একটি সমিতি গড়ে ওঠে। এই সমিতি জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করে। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে নীতি প্রণয়নের জন্য কংগ্রেস রীতিমত চিন্তাভাবনা শুরু করে। ইতিমধ্যে লর্ড কার্জন দমনমূলক কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতে থাকায় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এর খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন বাংলাকে ভাগ করলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। স্বদেশী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য প্রস্তুত করে ব্যবহার করা। আত্মনির্ভর জাতি হিসাবে ভারতীয়দের মধ্যে চেতনা আনা। শিল্প এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলন সবচেয়ে বেশি সাড়া ফেলেছিল। ফলে কাপড়, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, সাবান ইত্যাদি ভারতীয়রা নিজেরাই কারখানা খুলে প্রস্তুত করতে থাকে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের মেজাজ খুব বেশিদিন স্থায়ী না হওয়ায় এর যে ফলপ্রসূ চিন্তাভাবনা অচিরেই ব্যাহত হতে থাকে। বলা বাহুল্য বর্তমানে এমন অনেক শিল্প কারখানা চলছে যেগুলির আদিতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

লর্ড কার্জন উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হওয়ায় ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের বিরাগভাজন হন। এঁরা আত্মনির্ভরতা ও স্বদেশীয় চিন্তাভাবনার ব্যাপারে ব্যাপক কর্মসূচী নেন। ফলে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল স্থাপিত হলে কংগ্রেস এতে যোগ দেয়। এই বৎসরেই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় বেনারসে শিল্প আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা চক্রের ভিত্তিতে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর কলেজ অফ্ ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য স্বদেশী আন্দোলনে এবং শিক্ষা আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠান। বলা যেতে পারে ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়েছিল এই সময় থেকে।

বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়াই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাছাড়া বিশেষ ধরনের গবেষণা এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণের উপর বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয় অর্থাৎ বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণাগার ছাড়াও এসব কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয় যার মূল উদ্দেশ্য হল গবেষণাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণ। ফলে স্বদেশীয় মেধা এবং উপাদানের সঠিক ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়। তাছাড়া স্থানীয় ভাষায় এইসব শিক্ষাদান ও কার্যক্রম পরিচালিত

Scanned with CamSc

করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। জনসাধারণের উৎসাহ এবং জাতীয় কংগ্রেসের আগ্রহ থাকলেও এই আন্দোলন দুঃখের বিষয় স্তিমিত হতে থাকে। তবে এই চিন্তাধারা ভবিষ্যতের চিন্তাধারাকে বিশেষ প্রেরণা দিতে থাকে। যদিও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন যাদবপুরে যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে যায়নি এবং জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নেই, তামিলনাড়ু ও অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে পালিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন যখন ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত শিল্প এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কাঙ্খিত ফল লাভ করতে পারলো না, তখন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ধারণা হল উপনিবেশিক ব্যবস্থার জন্যই এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে কিছুটা সুযোগ নেয়। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারকে বোঝাতে থাকেন— ভারতবর্ষে শিল্প এবং বিজ্ঞান চর্চার উন্নতি ঘটাতে না পারলে সমূহ বিপদ। যুদ্ধের সময় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শাসকে একথা বারে বারে বোঝাতে থাকেন। ব্রিটিশ শাসকদের বলা হল কারিগরী শিক্ষা, গবেষণা এবং শিল্প স্থাপনের জন্য সমীক্ষা ইত্যাদি করা প্রয়োজন। যুদ্ধের জন্যই শাসকগোষ্ঠী এ ব্যাপারে নরম হতে থাকেন এবং কিছুটা সহযোগিতা এবং গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে "ইন্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিয়াল কমিশনের" প্রতিবেদনে এই সহযোগিতার মনোভাব প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশু ব্যবস্থা সম্পর্ক একটি রূপরেখা দেওয়া হয়। তবে এই প্রতিবেদনের সঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য এই সম্ভাব্য শিল্প, কৃষি, পরিবহন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ছিল। পণ্ডিত মালব্য এসব ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অনগ্রসরতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং ব্রিটিশ শাসকদের নীতিই এর জন্য দায়ী বলেছেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন ..... "If the industries of India are to develop and Indians to have a fair chance in the competition to which they are exposed, it is essential that a system of education at least as good as that of Japan should be introduced in India."

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন শাখা বিশেষ করে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, নৌবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন। অবশ্য অতীতে কৃষিবিদ্যার পঠন পাঠন সম্পর্কে বলেছেন। তবে সাময়িক এবং অস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছিল। মদনমোহন মালব্য কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। তিনি কৃষিবিদ্যার উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন তবে এক্ষেত্রে মালব্যের দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক ছিল। গান্ধিজির চিন্তাধারায় "কৃষি" খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে গান্ধিজি কুটীর শিল্পকে বেশি গুরুত্ব দিতেন কিন্তু পণ্ডিত মালব্য আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা ভাবতেন।

মদনমোহন মালব্য শুধুমাত্র তাঁর মতামত দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার জন্য ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানে গবেষণার উপর গুরুত্ব দিতে থাকে। একথা সত্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তখন পর্যন্ত মৌলিক গবেষণা ভারতবর্ষে সুষ্ঠুভাবে করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়নি। অর্থাৎ বিজ্ঞান সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের চিন্তাভাবনা কিছুটা বিক্ষিপ্ত ও অনিয়মিত ছিল। গান্ধীজী আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। তিনি আধুনিক সভ্যতা ও যন্ত্রকে খারাপ চোখে দেখতেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কুটির শিল্প এবং খদ্দরের উপর গুরুত্ব দিয়েছিল। বলা বাহুল্য এসব ক্ষেত্রে নিম্নস্তরের প্রযুক্তি ও নিম্নমানের দক্ষতাতেই কাজ চলতে পারতো। চিকিৎসা এবং স্বাস্যবিজ্ঞান সম্পর্কে গান্ধিজির মনোভাব মোটেই আধুনিক পর্যায়ে ছিল না। ফলে এর প্রতিফলন জাতীয় কংগ্রেসের চিন্তাভাবনায় প্রতিফলিত হয়। গান্ধিজি নিজেই নেচারোপ্যাথীতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নিজের চিকিৎসার ব্যাপারে এই পদ্ধতির সাহায্য নিতেন। সত্যিই আমাদের বিস্ময় জাগায় বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান চিন্তা যখন এত উন্নত ছিল তখন গান্ধিজির এই ধরনের চিন্তাভাবনা দেশকে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছনের দিকে টেনে নেবার একটা প্রবণতা হিসাবে দেখা যেতে পারে।

আমরা যদি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের বিজ্ঞান চিন্তা নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে এই সময় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রযুক্তি, প্রথাগত বিজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে বিতর্ক বা এক অলিখিত প্রতিযোগিতা কাজ

Scanned with CamSc

করতো। জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে এ নিয়ে বিতর্ক ছিলই তাছাড়া ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকে গান্ধিজির চিন্তাকে সমর্থন করতেন।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ বা তার পরেও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে গান্ধিজির দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কাটিয়ে উঠতে পারেনি অর্থাৎ সনাতনী শিল্প এবং ঘদ্দরই জাতীয় কংগ্রেসের নীতির অন্যত স্তম্ভ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। বলতে গেলে এই সময় জাতীয় নেতৃবৃন্দ জাতীয় একতা ও স্বাদেশিকতার দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্দে সময় থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষে চর্চা হোক, একদল ভারতীয় বিজ্ঞানী ও জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তা চাইতেন। ইতিমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক চর্চার উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন এবং এর ফলে অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এদিকে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা আসতে থাকায় ১৯২০'র দশকের শেষ দিকে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নূতনভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলি ভাবতে শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা উপলব্ধি করেন— ভারী শিল্প এবং সমাজতন্ত্র উভয়ে দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর। এ ব্যাপারে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বোস প্রমুখ জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আধুনিক বিজ্ঞান ও ভারী শিল্পের অনুকূলে মতামত ব্যক্ত করেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের একটি নতুন অ্যাক্টের জন্য জাতীয় কংগ্রেসকে বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হয় এবং জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। সীমিত স্বশাসন এই সময় পাওয়া যায় যা পূর্ম স্বাধীনতার পূর্ব লক্ষণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। নতুন পরিস্থিতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বৃহত্তর দায়িত্বের সম্মুখীন হয়। অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং পূর্ণোদ্যমে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির একটি নৈতিক দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে চেপে বসে। এর ফলে বড় ধরনের জাতীয় পরিকল্পনা অনুভূত হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বোস 'ন্যাশানাল প্লানিং কমিটি' গঠন করেন এবং চেয়ারম্যান হন পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ড. মেঘনাদ সাহা, ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, শিল্পপতি পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ, অম্বলাল সরাভাই, অর্থনীতিবিদ্ কে. টি. শাহ অন্যতম। এঁরা ছাড়াও কমিটিতে আরও কয়েকজন প্রথিতযশা ব্যক্তি সদস্য হিসাবে ছিলেন। এর ফলে বলা যেতে পারে এই কমিটি সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রথিতযশা ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দেই এই কমিটি সাতাশটি সাব কমিটি গঠন করে কাজকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে, ফলে এই কমিটির কাজকর্ম ব্যাহত হয়। বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কমিটির অধিবেশন চলেছিল। কিন্তু তারপর ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন হয় এবং এক্ষেত্রে আর্থ সামাজিক কর্মসূচী ব্যাহত হয়। জওহরলাল নেহরু তখন কারান্তরালে ফলে এই কমিটির কাজকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এই কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের ধ্যান ধারণা প্রতিফলিত হয়।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মূল লক্ষ্য হল দেসের শিল্পায়নের জন্য একটি সর্বার্থসাধক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভারী ও মাঝারি শিল্প, কুটীর শিল্প ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে পরিকল্পনার পূর্বে আমাদের জাতীয় প্রয়োজন, দেশের সম্পদ এবং আমাদের দেশের বৈচিত্র্যময় সামাজিক, আর্থিক অবস্থার কথা মাথায় রাখতে হবে। দারিদ্র্য মেনে বেকারত্ব হঠাতে, জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের শিল্পায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একথা সত্য ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটির সদস্যরা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহারের কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা জাতীয় কর্মধারার প্রত্যেকটি শাখায় গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করেন। এঁরা কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, যোগাযোগ, বিজ্ঞান শিক্ষায়, কারিগরী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য ইত্যাদিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং কংগ্রেস মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করায় অচিরেই এই পরিকল্পনা ব্যাহত হয়।

ন্যাশনাল প্লানিং কমিটি বেশ কয়েকটি সাব কমিটি গঠন করেছিল। এরমধ্যে কারিগরী শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের সাব কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় বিখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাকে এবং এর সদস্যবৃন্দ ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথিতযশা বিজ্ঞানীবৃন্দ। সাধারণ শিক্ষার জন্য যে সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটিও বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

Scanned with CamSc

অবশ্য এই সাব-কমিটি উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে স্বশাসনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাছাড়া মৌলিক গবেষণার উপরেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পলিটেকনিক স্কুল ও কলেজ স্থাপনের কথাও বলেছিলেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য ন্যাশনাল প্লানিং কমিটির সুপারিশ ততটা কার্যকরী হতে পারেনি। তবে কংগ্রেসের এই পরিকল্পনা বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কিছু সহৃদয় ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হন। এ ব্যাপারে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস, ন্যাশন্যাল ইনস্টিউট অফ সায়েন্স, দি ইন্ডিয়ান একাডেমী অফ সায়েন্স, শীলা ধর ইনস্টিটিউট অফ সয়েল সায়েন্স, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, শ্রীরাম ইনস্টিটিউট অফ ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য।

অপরদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের প্রয়োজন এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য যে সব সরঞ্জাম প্রয়োজন তা যোগান দেবার জন্য ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসকবৃন্দ তাঁদের নীতি কিছুটা পরিবর্তন করেন। তাঁরা বিজ্ঞান গবেষণা ও শিল্প উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন। এ ব্যাপারে সরকার পক্ষ তথ্য অনুসন্ধান করতে থাকেন এবং ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের বোর্ড গঠন করেন। এইসব বোর্ডের সদস্যরা ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীবৃন্দ এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরিকল্পনা কমিটির সদস্য ছিলেন। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ড. নাজির আমেদ, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর প্রমুখ বিজ্ঞানীগণের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানটির মুখপত্র ছিল ''সায়েন্স এ্যান্ড কালচার''। বলতে দ্বিধা নেই ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্বে ছিলেন ড. মেঘনাদ সাহা। লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণ এবং ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনা। এঁরা গান্ধিজির অর্থনৈতিক চিন্তার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এঁরা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার মডেলের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং এই মডেলেই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আদর্শ বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে ড. মেঘনাদ সাহা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বোসকে ড. মেঘনাদ সাহা ভারতবর্ষের লেনিন বলে মনে করতে থাকেন। এই বিষয়ে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মেঘনাদ সাহা সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে দেখা যায় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের কার্যক্রমে জাতীয় পরিকল্পনা এবং শিল্পায়নের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে সম্মত হন। এই গোষ্ঠীই কংগ্রেসের নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। বলা যেতে পারে এই গোষ্ঠীর প্রভাবেই ভারতবর্ষ আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা এবং ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি করে।

Scanned with CamSc